Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-IV, April 2017, Page No. 35-45
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও মূল্য

তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এস.ভি.এস.জি.সি., ইউ.জি.সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
শিপ্রা ঘোষ
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Radh region is known as 'Radh Bengal' of undivided Bengal. Radh Bengal is a total territory of Bengal that includes the districts of Birbhum, Burdwan, Bankura, Paschim Medinipur, Purulia and some parts of Howrah, Hooghly, Murshidabad district. There are many terracotta temples situated here and these are architecturally, educationally, culturally magnificent and significant. Moreover, the terracotta temple architecture of this region is of its own class and full of varieties. Most of the terracotta temples were built by the Malla Dynasty. Particularly, terracotta plaques fixed on temples comprise valuable elements for reconstructing the mythological, historical and socio-cultural heritage. There is scope for research in various aspects like art education, architecture, socio-cultural, socio-economic, religious practices etc. and also the important region overall development of temple architecture in Bengal. This region has significant values in the society as cultural heritage resources. The region also provides opportunities for public understanding and appreciation of the rich terracotta tradition and development of traditional temple architecture. Thus, in this paper we will try to bring forward the main features of the terracotta temple architecture of Radh Bengal and its educational and socio-cultural values and significance.

Keyword: Educational Value, Cultural Value, Temple, Terracotta, Architecture, Significance.

১. ভূমিকা: বাংলার এক সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদ হল রাঢ় অঞ্চল বা রাঢ়বাংলা। এই রাঢ়বাংলার অর্ন্তভুক্ত হল বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও মুর্শিদাবাদের কিছু স্থান। ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যে রাঢ়বাংলার মন্দির-স্থাপত্য যথেষ্ট গৌরবময় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের

অসাধারণ নৈপুণ্য এই রাঢ়বাংলার বিভিন্ন জেলার মন্দির-স্থাপত্যের মধ্যে দেখা যায়। এই অঞ্চলে বিভিন্ন রীতির ও শৈলীর টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায়, যার অলংকরণ শৈলী সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে এক নিঁখুত চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। এখানে চালা, রত্ন, চাঁদনী, দালান প্রভৃতি রীতির মন্দির-স্থাপত্যের গায়ে সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি কাহিনির চিত্র-ফলক শুধুমাত্র তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের পরিচয় করায় না এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা মন্দিরের নান্দনিক, পুরাতাত্ত্বিক, ও ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারি। এর সূত্র ধরে আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করবো- রাঢ়বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ঐতিহ্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত মূল্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে।

২. অনুশীলন ক্ষেত্রে হিসাবে রাঢ়: রাঢ়বঙ্গের সীমানা বিশাল ও বৃহৎ। রাঢ়বঙ্গের উত্তরদিকে রয়েছে বীরভূম, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে রয়েছে মেদিনীপুর, পূর্বদিকে রয়েছে বর্ধমান ও হুগলি এবং পশ্চিমদিকে পুরুলিয়া। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা রুক্ষ শুষ্ক হলে কি হবে লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এই জেলার মধ্যে। লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের একটি অংশ হল টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য। আর এই মন্দিরগুলি আমরা বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার নানান স্থানে দেখতে পায়।

৩. রাঢ়ের ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিচয়: রাঢ়বঙ্গে নানা জাতি ও উপজাতির মানুষের বসবাস রয়েছে। রাঢ়বঙ্গ রুক্ষ, শুষ্ক, অনুর্বর ও কঙ্করময়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানকার লোকজনদের কঠোর পরিশ্রম করে জীবনযাপন করতে হয়। তা সত্ত্বেও এখনকার মানুষজনদের মধ্যে আবেগ ও অনুভূতির কমতি নেই। এই রাঢ়বঙ্গে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। এছাড়া সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মনোরঞ্জনের বৈচিত্রময় দিকগুলি পরিলক্ষিত হয়। এর সূত্র ধরেই এবার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো রাঢ়ের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রসঙ্গে।

৩.১ ঐতিহাসিক পরিচয়: বঙ্গদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীন জনপদ হল রাঢ়। এই রাঢ় শব্দটি একটি প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত শব্দ। ভারতবর্ষের বহু ভাষাতেই এই রাঢ় শব্দটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। রাঢ় নামক প্রাচীন শব্দটি বেদ, পুরাণ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীন সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন পুঁথি প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্নভাবে পেয়ে থাকি। রাঢ়বঙ্গের ঐতিহাসিক পরিচয়, নামকরণ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, তাৎপর্য প্রভৃতি নিয়ে মতভেদের শেষ নেই। বিভিন্ন পন্ডিত, ইতিহাসবিদ ও গবেষকেরা রাঢ় নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে সেইসব মতের পাল্টা বিপরীত মতও প্রকাশ করেছেন।

৩.২.ভৌগোলিক পরিচয়: রাঢ়ভূম রুক্ষ শুষ্ক ও লালমাটির দেশ; এর চারিদিকে বেষ্টন করে আছে ডুংরি-দারাং এর ঝোপঝাড়, বন জঙ্গল, টিলা মালভূমি, পাহাড়, খাদ প্রভৃতি। শুশুনিয়া, মশক, অযোধ্যা, পঞ্চকোট প্রভৃতি পাহাড় এবং দামোদর-দারকেশ্বর, কাঁশাই, শিলাই, ময়ূরাক্ষী, অজয়, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদী এবং বাবলা, কেঁদ, শিয়াকুল প্রভৃতি ঝোপ। ধূ ধূ করা মাঠ, প্রচুর চাষযোগ্য জমি কিন্তু এক অংশে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় আর এক অংশে ফসল সেভাবে জন্মায় না। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে রূপান্তরিত বেলে পাথর, পাললিক শিলা, গ্রানিট, গ্রাফাইট, ক্লে আয়রন, ল্যাটেরাইট শিলা, স্টেল পাথর ইত্যাদি।

৩.৩. আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়: লালমাটির দেশ রাঢ়বঙ্গে বসবাস করে সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, মাহালি, ডোম, বাগদি, মুচি, শুঁড়ি ইত্যাদি জাতি ও উপজাতির মানুষ। এছাড়া রয়েছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, কামার, ছুতোর, তাঁতি প্রভৃতিরাও। এই অঞ্চল ঝুমুর, টুসুগান, ভাদুগান, পাতানাচ, কাঠি নাচ, করম, বাঁধনা, বাহা প্রভৃতি উৎসব, ছড়া, ধাঁধাঁ, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানে সমৃদ্ধ। এছাড়া এই অঞ্চল মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প, তাঁত শিল্প, কাঁসা-পিতলশিল্প, লৌকিক চিত্রকলা প্রভৃতি অনুপম শৈল্পিক চেতনার পরিচয়বাহী। রাঢ় অঞ্চলের শিল্প

সম্পদের কদর শুধু ভারতবর্ষ নয় ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। পাঁচমুড়ার ঘোড়া, বিষ্ণুপুরের মন্দির-স্থাপত্য ও তাঁত, মেদিনীপুরের পট প্রভৃতি আজ জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে নিয়েছে।

৪. রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহ্য ও রীতি: পশ্চিমবঙ্গের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে রাঢ়ের মন্দির-স্থাপত্যকলার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলন বা সমন্বয় রাঢ়ের রীতি ও শৈলীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রাঢ় বাংলার অঞ্চলগুলিতে, চালা, মঞ্চ, রত্ন, সমতল ছাদ, দালান প্রভৃতি রীতির মন্দির চোখে পড়ে। এইসব মন্দিরগুলির গায়ে পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর মূর্তি রয়েছে যা আজও বিস্ময় হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসাবে নয়, এই সব অঞ্চলের স্থান বিশেষের মন্দিরগুলি থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে মৌলিক উপাদান সংগৃহীত হতে পারে গভীর অনুধ্যানের দ্বারা তা বোঝা যায়। রাঢ় বাংলা নদী মাতৃক অঞ্চল, নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়া বিস্তৃর্ণ স্থানসমূহ দোচালা, চারচালা, জোড়বাংলা, আটচালা, চাঁদনি একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন প্রভৃতি বাংলা রীতির বেশ কিছু মন্দির দেখা যায়। এই ধরনের মন্দিরগুলি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। তবে এই সমস্ত স্থানে চালা, চাঁদনি ও রত্ন মন্দিরের আধিক্যই বেশি *(চিত্র নং- ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬)*।

চিত্র নং-১ চালা রীতির মন্দির

চিত্র নং-২ একরত্ন রীতির মন্দির

চিত্র নং-৩ সমতল ছাদের মন্দির

চিত্র নং-৪ জোড়বাংলা রীতির মন্দির

চিত্র নং-৫ দেউল রীতির মন্দির

চিত্র নং-৬ পঞ্চরত্ন রীতির মন্দির

৫. অলংকরণ শৈলী: মন্দির হল হিন্দুধর্মের আরাধনা স্থল বা প্রার্থনা গৃহ। তাই মন্দিরকে বলা হয় স্থায়ী উৎসর্গের নিদর্শন ক্ষেত্র। এই মন্দিরগুলি এক সময় রাজা, জমিদার বা বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। রাঢ়বঙ্গের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলিকেও আমরা স্থায়ী উৎসর্গের নিদর্শন হিসাবে ধরতে পারি। এইসব মন্দির-স্থাপত্য শৈলীগত উৎকর্ষ ও শিল্প সক্রিয়তায় সমুজ্জ্বল। মন্দির নির্মাণে চতুর্দিক জুড়ে রয়েছে টেরাকোটার নতোন্নত ইঁট। এই ইঁটগুলি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে গণিতের ছকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মন্দিরগুলির অলংকরণ শৈলী সমকালীন কারিগরদের স্থাপত্য চিন্তা ও শিল্পবোধের সাক্ষ্য বহন করছে। টেরাকোটা ফলকগুলির মাধ্যমে নান্দনিক দিক থেকে সৌন্দর্যবর্ধন করা সম্ভবপর হয়েছে। লম্বাটে ও চৌকোনা ফলকে Bas Relief –এ বিভক্ত কাহিনির দৃশ্যকে টেরাকোটা ফলকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আবার কখনও কখনও মন্দিরগুলির পার্শ্বের প্যানেল বা মন্দিরের

সম্মুখভাগের ঠিক ওপরের অংশে ও নীচের দিকে লম্বা লাইন করেও বিভিন্ন কাহিনি সম্বলিত দৃশ্যগুলিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সাধারণভাবে বিষয় ও অলংকরণের ধরণ অনুসারে ফলকগুলিকে পর্যায়ক্রমে আড়াআড়িভাবে (Horizontal) ও খাড়াখাড়িভাবে (Vertical) দেওয়ালগাত্রে সংযুক্ত করা থাকে। এগুলির আকৃতি বর্গাকার (Square), আয়তকার (Rectangular), ত্রিকোণ (Triangle) এবং গোলাকার (Circle) হয়ে থাকে। এছাড়া মানুষ, জীবজন্তু, ফুল-ফল ইত্যাদির আকৃতি অনুসারে ফলকের আকার পরিলক্ষিত হয়। ফলকের মাপও বিভিন্ন রকমের যেমন- ১৮X ১২ ইঞ্চি, ১৫X ১২ ইঞ্চি, ১৫X ৬ ইঞ্চি, ১২X ৮ ইঞ্চি, ১০X ৮ ইঞ্চি, ৬X ৬ ইঞ্চি, ৪X ৪ ইঞ্চি ইত্যাদি। তৎকালীন শিল্পী কারিগরেরা রাঢ়ের মন্দিরগুলিতে টেরাকোটা ফলকগুলিকে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করেছে যে ফলকগুলি আকৃতিসমূহ ও শিল্পরীতির প্রতিফলন দেখে মনে হয় এইসব ফলকগুলি মন্দিরগাত্রে জীবন্তরূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

৬. স্বকীয়তা: রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের যেসব স্বকীয়তা দিকগুলি রয়েছে সেগুলি হল:

প্রথমত: রাঢ়বঙ্গে বিভিন্ন রীতি ও শৈলীর টেরাকোটা মন্দির দেখা যায়।
দ্বিতীয়ত: এখানকার বেশিরভাগই মন্দিরই অন্ত-মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়।
তৃতীয়ত: এই অঞ্চলের মন্দিরগুলি রাজা, জমিদার, বা বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল।
চতুর্থত: মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় মানুষরা সেরকম কোন তথ্য দিতে পারে না।
পঞ্চমত: এখানকার মন্দিরগুলিতে শিব, দুর্গা, রাধা কৃষ্ণ, কালী, নারয়ণের পূজা হয়।
ষষ্টত: বেশিরভাগ মন্দিরের চূড়ায় বজ্রদন্ড বা ত্রিশূল দেখা যায়।
সপ্তমত: এখানকার মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের ফলক দেখা যায়।
অষ্টমত: পুরাকীর্তির এইসব অমূল্য সম্পদগুলিকে দেখার উদ্দেশ্যে বহু দর্শক, পর্যটক, গবেষক, রাঢ়বঙ্গে পর্যটনের উদ্দেশ্যে আসে।

৭. রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও মূল্য: পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও মূল্য অপরিসীম। এক্ষেত্রে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে নানাবিধ মূল্য বা value। প্রবন্ধের এই অংশে আমরা রাঢ়ের মন্দির-স্থাপত্যগুলির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও মূল্য সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

৭.১. তাৎপর্য: অন্ত-মধ্যযুগে রাজা, বিত্তবান ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার টেরাকোটার মন্দির নির্মিত হয়েছিল কিন্তু সঠিক সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক স্থাপত্য কীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। এইসব মন্দির-স্থাপত্যগুলি সমাজের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজও বেঁচে রয়েছে এবং যার মাধ্যমে আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও শিল্পবোধের পরিচয় লাভ করতে পারি।

রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে অন্ত-মধ্য যুগের স্থাপত্যকলার যে চরম উন্নতি ঘটেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের উৎকর্ষতার প্রভাব বাংলার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, রাঢ় অঞ্চল তার ব্যতিক্রম ছিল না। রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দিরগুলি ইঁট ও চুন সুরকি দ্বারা পৃথক এক পদ্ধতিতে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল, যেখানে ব্যবহৃত ইঁটের ছাঁচ এবং পোড়ামাটির ফলকগুলি মন্দিরের প্রাকৃতিক এবং বাস্তবিক সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে।

রাঢ় বাংলার মন্দির-স্থাপত্যগুলি পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করে যে, এই স্থানটি তৎকালীন স্থাপত্যকলার অন্যতম সাক্ষী বহন করে চলেছে। রাঢ়ের মন্দিরগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল রাজা, জমিদার ও স্থানীয় বিত্তবানেরা। এঁদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল: মল্ল রাজবংশ, বর্ধমানের রাজপরিবার, রানি ভবানী, মলুটীর রাজা বাজবসন্ত প্রমুখেরা। এইসব রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় রাঢ় বঙ্গে একের পর এক মন্দির-স্থাপত্য তৈরি হয়। তাই বিভিন্ন গবেষক ও পন্ডিতেরা রাঢ়বঙ্গকে 'মন্দিরের হৃদয়ভূমি' বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে এখানে বিভিন্ন রাজবংশের কার্যকলাপ ও তৎকালীন সমাজের পরিচয়ও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

মাটির সহজলোভ্যতার দরুন রাঢ় বাংলার ইঁটের মন্দিরের সংখ্যা অসংখ্য। সেইজন্যও রাঢ়বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের অলংকরণ বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিয়েছে। এখানকার মন্দির-স্থাপত্যগুলি বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র বহন করে নিয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। আর বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে ভরপুর রাঢ় বাংলার এই অমূল্য সম্পদগুলি দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৭.২ মূল্য: রাঢ়বাংলা একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ও প্রাচীন জনপদ তাই এর value বা মূল্যকে কোন অংশেই অস্বীকার করা যায় না। মূল্য সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল এবং সমাজের উপর নির্ভরশীল। রাঢ়বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যগুলিকে এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হল:

৭.২.১ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য: রাঢ়বঙ্গ সেই অন্ত-মধ্যযুগ থেকে কয়েক হাজার টেরাকোটার মন্দির সংরক্ষণ করে আসছে। এইসব টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি সমকালীন সময়ের বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐশ্বর্য, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক পরিবেশ সব কিছুরই সাক্ষী বহন করে নিয়ে চলেছে। এছাড়া এই স্থাপত্যকীর্তিগুলি তৎকালীন সময়কার বিভিন্ন রাজা, জমিদারদের আর্থ-সামাজিক জীবন সম্পর্কেও পরিচয় দেয়। এই স্থাপত্য কীর্তিগুলি আঠারো উনিশ শতকের ধর্মীয় অভ্যাস ও রীতিনীতি সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান প্রদান করে। মন্দিরের ওপর ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে খচিত লিপিগুলি শুধুমাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কেই উল্লেখ করে না, সেই সময়কার বাংলার বিভিন্ন লিপি ও হরফ সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করে।

যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের যেমন পুরাতত্ত্বগত মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য। ইতিহাস হল অতীতের ঘটা কোন অবিশ্লেষিত ঘটনা সম্বন্ধীয় পান্ডিত্যপূর্ণ অধ্যয়ন। রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টেরাকোটার মন্দির-স্থাপত্যের শিল্পকার্যগুলি আঞ্চলিক ইতিহাসের নির্মাণের উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। এইসব মন্দিরগুলির গায়ে পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। এগুলি কতকাল আগে আমাদের দেশীয় কারিগরদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে আজও আমরা অজ্ঞ রয়েছি।

শুধুমাত্র ধর্মস্থান হিসাবেই নয় এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের মন্দিরগুলি এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মৌলিক উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করে। মন্দিরগুলি তাই ধর্মচর্চার জন্য ধনী জমিদারদের শোষণের ঐশ্বর্যছটার বিলাস নয় এতে ধনীর বিলাসের থেকে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়। তাই অন্যান্য পুরাবস্তুর তুলনায় আমাদের এই মন্দিরগুলির বয়স খুব বেশী না হলেও অন্তত চার-পাঁচশ বছর আগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কীত তথ্য এই শেষ মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলি থেকে সংগৃহীত হতে পারে, যার গুরুত্ব দেশের সামাজিক ইতিহাসের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। অন্যদিকে শিল্পচর্চার ইতিহাসগত যে ক্রমবিকাশ এবং তার রূপরেখা নির্মাণের ক্ষেত্রেও মন্দিরগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাঢ় বঙ্গ একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। কাজেই প্রাচীন টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের প্রাচুর্য ও শিল্পনৈপুণ্যের বিচারে রাঢ়বঙ্গের মন্দির-স্থাপত্যের পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট গৌরবময়।

৭.২.২ শৈল্পিক এবং নান্দনিক মূল্য: রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে অবস্থিত উচ্চ গুণমানের টেরাকোটা ফলকের মাধ্যমে শৈল্পিক ও নান্দনিক মূল্য ফুটে উঠেছে। রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানের টারাকোটা মন্দির-স্থাপত্যকলা দেখলে বোঝা যায় বাংলার অন্ত- মধ্যযুগীয় সময়েও টেরাকোটা ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল। পোড়ামটির ফলকের ওপর প্রতিস্থাপিত

বিভিন্ন দৃশ্য যেমন- রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্রাঙ্কন এবং প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুলের বিভিন্ন অবস্থানগুলির মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সময়ের মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাস ও অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব মন্দির-স্থাপত্যগুলি যে সব শিল্পীরা নির্মাণ করেছিলেন তারা দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন সে প্রমাণ এখানকার মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণ দেখলেই বোঝা যায়। স্থাপত্যের খাঁজে খাঁজে ছোট বড় নানা আকারের ফলকের ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরের সামনে, পিছনে, পার্শ্বে পার্শ্বগাত্রে বিভিন্ন দিক থেকে ফলকের প্রতিস্থাপন করেছেন শিল্পীরা, যা থেকে বোঝা যায় অনেক হিসাব-নিকাশ করে ফলকগুলিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য হল অম্বিকা-কালনার গোপালজী ও লালজী মন্দিরের 3D ফলক, বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের নবনারীকুঞ্জের ফলক, মুর্শিদাবাদের চারবাংলা মন্দিরের বিষ্ণুর ফলক ও ভট্টবাটির রত্নেশ্বর শিবমন্দিরে মৈথুন দৃশ্যের ফলক ইত্যাদি। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা ইত্যাদি এত স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে শিল্পীরা টেরাকোটা ফলকের মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছে যা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে। মন্দির-স্থাপত্যের দেওয়াল, খিলান, প্রবেশদ্বার এমনকি মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত অলংকৃত করে শিল্পীরা তাঁদের শিল্পীগুণ ও দক্ষতার পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখেছে। বাংলার অন্ত-মধ্যযুগীয় কালের এই নিদর্শনগুলি সেই সময়কার স্থানীয় কারিগর ও শিল্পীদের শিল্পীসত্ত্বার অন্যতম সাক্ষী বহন করে চলেছে, যা ভারতীয় শিল্পকলায় তাদের শিল্পগুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। এই সময় এই কারিগরেরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে মন্দির নির্মাণের এই কালপর্বটিকে শৈল্পিক দক্ষতার মধ্য দিয়ে বিপুলভাবে অলংকৃত ও প্রশংসনীয় উৎকর্ষতা বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত করেছেন।

টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য রীতির শৈলী ও অলংকরণের বিচারে লোকজ শৈল্পিক গুণ যেমন টেরাকোটা ফলকের মাধ্যমে মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং তা হয়ে উঠেছে নান্দনিক গুণ সম্পন্ন। মন্দিরগাত্রে অবস্থিত অগণিত টেরাকোটার ফলক পর্যবেক্ষণ করলেই সেই নান্দনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব ইঁটের তৈরি মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটি বা টেরাকোটার মূর্তি ভাস্কর্যগুলি প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে মন্দিরগুলির নান্দনিক ও ব্যবহারিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সব ধরনের কাহিনি বা ঘটনার সমাহার এখানকার মন্দির-স্থাপত্যে দেখা যায় সেগুলির অলংকরণ মন্দিরের কোন নির্দিষ্ট স্থানে হয় নি অর্থাৎ এক এক ঘটনার সমাহার এক এক জায়গায় চিত্র ফলকে শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন। ছোট বড় প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ফলকে আমরা বিভিন্ন ঘটনার সমাহার দেখতে পায়। একঘেয়েমি ঘটনার দৃশ্য চিত্র থেকে পর্যটকদের চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য প্যানেলগুলির ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীরা ফুল, লতা, পাতা, ও জ্যামিতিক নকশার চিত্রও ব্যবহার করেছেন। মন্দিরগাত্রের প্রতিটি ফলকের চতুর্দিকে বর্ডার বা সীমারেখা থাকার ফলে এগুলি যে প্রকৃতপক্ষে স্থাপত্য নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ইঁট তা বুঝতে অসুবিধা হয় না *(চিত্র নং ৭, ৮ ও ৯)*।

চিত্র নং-৭ ত্রিমাত্রিক ফলক

চিত্র নং-৮ নবনারীকুঞ্জ

চিত্র নং-৯ রাসমণ্ডল

৭.২.৩ স্থাপত্য ও কারিগরী মূল্য: পোড়ামাটির অলংকরণ এবং ইঁটের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়কার কারিগর শিল্পীদের দক্ষতার অন্যতম সাক্ষ্য বহন করে চলেছে রাঢ়ের এই ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি। এই মন্দিরগুলি নির্মাণের প্রধান উপাদান ছিল পোড়ামাটি, ইঁট ও চুন। এইসব ঐতিহ্যময় মন্দিরগুলির বহির্ভাগে ব্যবহার করা হয়েছিল বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলক, যার ফল স্বরূপ তৈরি হয়েছিল নানান প্রকারের স্থাপত্যশৈলীর সুন্দর মিশ্রণ - যা রাঢ় বাংলাকে আলাদা পরিচয় দান করেছে। চুন, সুরকি ও পাতলা ইঁট গেঁথে এখানকার মন্দিরগুলি তৈরি করা হয়েছিল। মন্দিরগুলির উচ্চতা মোটামুটি ১০-৭০ ফুটের মধ্যেই অবস্থিত। প্রায় সব মন্দিরের উপরে রয়েছে ব্রজদন্ড বা ত্রিশূল। লম্বাটে ও চৌকোনো ফলকে Bas Relief এ বিভিন্ন কাহিনির দৃশ্যকে মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার ফলকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সাধারণভাবে বিষয় ও অলংকরণের ধরণ অনুসারে ফলকগুলি পর্যায়ক্রমে আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়িভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। বেশিরভাগ মন্দিরের প্রবেশ পথ অত্যন্ত ছোট। দরজার উচ্চতা ৪ ফুট থেকে ৫ফুট এবং চওড়া ১.৫ ফুট মত। চওড়া দরজা অপেক্ষা ছোট দরজার দেব-দেউলে মনোসংযোগ সহজ হবে এবং ছোট দরজায় বাধ্য হয়ে মাথা নিঁচু করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে এই ভেবেই মন্দিরের দরজাগুলিকে ছোট রাখা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত টেরাকোটার ফলকগুলি এত উচ্চমানের ও নিঁখুতভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যে, প্রথম নজরে এগুলিকে পাথর বলে মনে করা হয় - যা উচ্চমানের কারিগরী দক্ষতার নিদর্শন হিসাবে ধরা যায়।

৭.২.৪ ধর্মীয় আধ্যাত্মিক মূল্য: পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভরা রাঢ়বঙ্গকে জনসমক্ষে ও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে এখানকার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। পূর্বে এখানকার প্রায় সব মন্দিরেই পূজা করা হত কিন্তু বর্তমানে বেশ কিছু মন্দিরে পূজা হয় না কারণ সেগুলি ভারত সরকার দ্বারা National Heritage- র মর্যাদা পেয়েছে। রাঢ়বঙ্গে শিব, কালী, দুর্গা, নারায়ণ প্রভৃতি দেব-দেবীদের মন্দির দেখা যায়। তবে এর মধ্যে শিবের মন্দিরের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিব মন্দিরের উদাহরণ হল অম্বিকা-কালনার ১০৮ শিব মন্দির, বর্ধমানের ১০৮ শিব মন্দির, বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দির, মুর্শিদাবাদের চারবাংলা ও রত্নেশ্বর শিব মন্দির, বীরভূমের শীর্ষার শিব মন্দির ইত্যাদি। এইসব মন্দিরে সাদা ও কালো উভয় বর্ণের শিবলিঙ্গ দেখা যায়। প্রায় সব মন্দিরেই শিবলিঙ্গের সাথে গৌরীপাঠ রয়েছে। কিছু মন্দিরে নিত্য পূজা হয় আবার কিছু কিছু মন্দিরে বিশেষ তিথিতে পূজা করা হয় *(চিত্র নং-১০)*।

চিত্র নং- ১০ অম্বিকা-কালনার মন্দির চত্বর

৭.২.৫ আর্থ-সামাজিক মূল্য: অনেক প্রথাগত ও সামাজিক কাজকর্ম তথা অভ্যাস আজও এই অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান রয়েছে যার দরুণ এই অঞ্চলকে ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশীলন এবং পুরোনো প্রথা ও সম্বলিত তথ্যের ভাণ্ডার স্বরুপ বিবেচনা করা হয়। এখানকার অধিবাসীরা আজও বাংলার নানান ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি নীতিকে ধরে রেখেছে বিলুপ্ত হতে দেয় নি। সমগ্র রাঢ়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সুন্দর ও বৈচিত্রময়। এই অঞ্চলের ঝুমুর, টুসুগান, ভাদুগান, পাতানাচ, কাঠিনাচ, ছৌনাচ, বাদনা পরব, করম পূজা, ছড়া, ধাঁধাঁ, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানে সমৃদ্ধ। লোকশিল্পে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলের মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প, তাঁতশিল্প, কাঁসাপেতল শিল্প, লৌকিক চিত্রকলা প্রভৃতি অনুপম শৈল্পিক চেতনার পরিচয়বাহী।

ধর্মীয়দিক থেকে তো বটেই, এছাড়া এই অঞ্চলের সন্নিকটে বিভিন্ন মালভূমি, নদ-নদী ও বন জঙ্গলের অবস্থান হওয়ায় এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধর্মীয় পর্যটনে আসা মানুষদের আকর্ষিত করে। এছাড়া এই অঞ্চলের অনেকগুলি মন্দির -স্থাপত্য National Heritage র মর্যাদা পাওয়ায় অনেক পর্যটক ও গবেষক রাঢ় ভ্রমণে আসে। এছাড়া অনেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাঢ় অঞ্চলে মন্দির-স্থাপত্য দেখে আগ্রহী হয়ে এবং জানার ইচ্ছা নিয়ে দেশ বিদেশ থেকে এখানে ভ্রমণ করতে আসে।

৭.২.৬ অবস্থানগত বিন্যাস ও প্রাকৃতিক দৃশ্যগত মূল্য: রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দিরগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত রয়েছে যে এই মন্দিরে বিন্যাসগত দিকটিও এই অঞ্চলকে আলাদা মাত্রা প্রদান করেছে। এই মন্দিরগুলি রাঢ় অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন প্রান্তে এমনভাবে বিন্যস্ত রয়েছে যে এই মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষেরা একত্রিভূত হয়ে ধর্মীয় চর্চা ও সামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত করে। এছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকেও এই অঞ্চল অত্যন্ত মনোরম। এই অঞ্চলে মালভূমি, সমভূমি, পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, ঝর্ণা, পুকুর, খোলামেলা চারণভূমি সবই রয়েছে যা সার্বিকভাবে এই রাঢ়ভূমকে প্রাকৃতিক দৃশ্যগত দিক থেকে অনন্যতা দান করেছে।

৭.২.৭ গবেষণা ও বিদ্যায়তনিক শিক্ষাগত মূল্য: সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যেমন- স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্য, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি। এই অঞ্চল বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ক গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র। এছাড়াও রাঢ়বঙ্গে অবস্থিত মন্দিরগুলির মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার দেশীয় ও ঐতিহ্যময় মন্দির-স্থাপত্যের ক্রমোন্নয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

৮. উপসংহার: পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভরা একটি অঞ্চল। যথার্থভাবে গবেষকরা তাই রাঢ়ভূমকে 'মন্দিরের হৃদয়ভূমি' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য। এতো বেশি বৈচিত্র্যময় স্থান ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বেশকিছু মন্দির সমন্বিত উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র (Site) National Heritage-র মর্যাদা পেয়েছে এবং অনেক স্থানের মন্দির যাতে National ও World Heritage-র মর্যাদা পায় তার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে। এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সাথে লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের গভীর যোগ রয়েছে। সার্বিক বিচারে এই স্থানের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। লোকঐতিহ্যের বিচিত্র ধারা এখানে সজীবভাবে বহমান। তবে এই ঐতিহ্য সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই অমূল্য সম্পদগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে - যা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা খুবই প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থপঞ্জী:

কোঙার, গোপীকান্ত (সম্পাঃ), বর্ধমান সমগ্র (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা: দে বুক ষ্টোর, ২০০২।

ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৮০।

ঘোষ, নীহার(ভাষান্তর শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), বাংলার মন্দির শিল্প শৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১২।

ঘোষ, প্রদ্যৎ, বাংলার লোকশিল্প, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

দাস, সুমাল্য (সম্পাঃ), অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্র অম্বিকা কালনা: ধর্মীয় ও পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস, কালনা: তটভূমি প্রকাশনী, ২০১২।

দাস, সুমাল্য (সম্পাঃ), অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্র অম্বিকা কালনা: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কালনা: তটভূমি প্রকাশনী, ২০১২।

দাশ, বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত, কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

মণ্ডল, সুজয়কুমার, লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, কলকাতা: নটনম্‌কোলকাতা, ২০১১।

মণ্ডল, সুজয়কুমার ও তনয়া মুখার্জ্জী, মলুটীর মন্দির টেরাকোটা, সিউড়ী, বীরভূম: রাঢ় প্রকাশনা, ২০১৫।

মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী ও অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, বাজের বদলে রাজ, বীরভূম: হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, নানকার মলুটী, বীরভূম: হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, ২০১২।

বন্দোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, বাঁকুড়ার মন্দির, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৪।

বসু, শ্রীলা, ও অভ্র বসু, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৫।

ভট্টার্চায্, শম্ভু, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, কলকাতা: মনন প্রকাশন, ২০০৯।

রায়, প্রণব, বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভার্স্কয, মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯৯।

চক্রবর্তী, রতনলাল, বাংলাদেশের মন্দির, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হাসান, খন্দকার, মাহমুদুল, প্রাচীন বাংলার প্রত্নকীর্তি, ঢাকা: পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১২।

সান্যাল, হিতেশরঞ্জণ, বাংলার মন্দির, কলকাতা: কারিগর প্রকাশনী, ২০১৫।

সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৮।

Bandyopadhyay, Sukhamay, Temples of Birbhum, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1984.

Chowdhury, Saifuddin, Early Terracotta Figure of Bangladesh, Dhaka: Bangla Academy, 2000.

Dasgupta, Prodosh, Temple Terracotta of Bengal, New Delhi: Crafts Museum, 1971.

Deva, Krishna, Temples of North India, New Delhi: National Book Trust, 1986.

Dey, Mukul, Birbhum Terracotta's, New Delhi: Lalit Kala Academy, 1959.

George, Michell(ed.), Brick Temples of Bengal, New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1983.

Mc Cutchion, David J, Late Mediaeval Temples of Bengal Kolkata: The Asiatic Society, 1972.

প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা:

Mandal, S.K. & T. Mukherjee. (2015). Bolpur Mahakumar Terracotta Mandir Sthapattya, *Sahabati,* 1(1), 34-50.

Mandal, S.K. & T. Mukherjee. (2015). Bishnupurer Oitijyamay Terracotta Mandir Sthapattya: Gathan-Riti O Alongkaraner Bisay Ebong Shaili, *International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (*Peer reviewed Online Journal), 1(6), 49-57.

Retrieved from http://www.irjims.com

Mandal, S.K. & T. Mukherjee. (2015). Jharkhander 'Mandirgram' Malutir Terracotta Mandir-Sthapatyae Pouranik Akkhyan: Ekti Adhyan, *Pritidhwani the Echo* (Peer reviewed Online Journal), 4(2), 08-16. Retrieved from http://www.theecho.in

Mandal, S.K. & T. Mukherjee. (2015). 'Mandirnagar' Ambika-Kalnar Terracotta Mandir Sthapttya: Ekti Puratattwik Nirikkshan, *International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (*Peer reviewed Online Journal), 1(11), 1-20. Retrieved from http://www.irjims.com

Mandal, S.K., Mukherjee, T & B. Mandal. (2016). The Traditional Terracotta Temple Architecture of the Temple Town Bishnupur: A Study on Structure, Style, Themes and Motifs of Ornamentation, *International Journal of Liberal Arts & Social Science (*Peer reviewed Online Journal), 4(1). Retrieved from http://www.ijlass.org

Mandal, S.K. & T. Mukherjee (2016). Jharkhander Mulutir Terracotta Mandir-Sthapattya-Riti O Shaili Ebong Samajik-Sanskritik Tatparjya O Mulya, *Shinjan* (*Multi displinary, Bi-annual, Multi-lingual and Peer reviewed*), 2(2), 92-105.

Mandal, S.K. & T. Mukherjee (2016). Nadiar Terracotta Mandir Sthapattyer Boichitra, Swakiyata, Riti, Shaili Ebong Alongkaraner Bishay O Motif, *International Journal of Humanities & Social Science Studies* (Peer reviewed Online Journal), 2(5), 34-47. Retrieved from http://www.ijhsss.com

Mandal, S.K. & T. Mukherjee. (2016). Banglar Terracotta Mandir-Sthapatyer Alongkarane 'Nari-Shakti'r Adhar Hisabe Dashmahaviddya Kahinichitrer Pratimurtir Motif: Ekti Nirikkshan, *Pritidhwani the Echo* (Peer reviewed Online Journal), 5(1), 01-17. Retrieved from http://www.theecho.in

Mandal, S.K. & R. Khan (2016). Asamer Khetri Anchaler Karbi O Boro Janajatir Oitijhyasroyi Gyan: Samikshanirbhar Parjyabekshan, *International Journal of Humanities & Social Science Studies* (Peer reviewed Online Journal), 3(2), 17-32. Retrieved from http://www.ijhsss.com

অনুগবেষণাপত্র:

মুখার্জ্জী, তনয়া, মলুটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য: একটি পুরাতাত্ত্বিক অন্বেষণ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, ২০১২।

ওয়েবসাইট :

www.maluti.com, Viewed on 15.07.2015
globalheritagefund.org, Viewed on 04.01.2015
www.aishee.org, viewed on 20.08.2015.
www.rangan-datta.Info\kalna.htm,viewed on 30.08.2015
travel.india.com>west Bengal, viewed on 30.08.2015.
www.radha.name\holy-places-gallery\West Bengal\kalna-lalji-Temple, viewed on 04.09.2015